১২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-

- ◆ পাঠ-১ : যুদ্ধের বিবরণ ও অক্ষশক্তির আত্মসমর্পন
- ◆ পাঠ-২ : যুদ্ধকালীন কূটনীতি ও বিভিন্ন সম্মেলন
- ◆ পাঠ-৩ : জাতিসংঘ
- ◆ পাঠ-৪ : এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতন
- ◆ পাঠ-৫ : স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমন, সমাপ্তি ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা

পাঠ - ১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবরণ ও অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ঘটনা জানতে পারবেন;
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত পরিবর্তনকারী যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত অক্ষশক্তি বলয়ের দেশসমূহের আত্মসমর্পণের বিষয়টি জানতে পারবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপে আবার সংকট সৃষ্টি হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিতে উগ্র জাতীয়তাবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। ১৯২৯-৩০ সালের মহামন্দা বিভিন্ন দেশে দূরাবস্থা সৃষ্টি করলে ফ্যাসিস্ট দলগুলি এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং জনসমর্থনকে ব্যবহার করে ইতালি ও জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে।

জার্মানিতে হিটলার এবং ইতালিতে মুসোলিনি ব্যাপক সমরসজ্জার সূচনা করেন। সমগ্র ইউরোপ দুটো পরস্পর বিরোধী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। জার্মানি ও ইতালি যুদ্ধের সূচনা করে। হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করে ব্রিটেন ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপ দখল সম্পন্ন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই হিটলার হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে সবাইকে বিস্মিত করেন। বিশ্বখ্যাত স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে রুশ লাল বাহিনীর হাতে হিটলারের সেনাবাহিনীর পরাজয় যুদ্ধের

মোড় ঘুরিয়ে দেয়। দূরপ্রাচ্যের আধিপত্য নিয়ে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। জাপান মার্কিন নৌঘাঁটি পাল হারবার আক্রমণ করলে যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। পর্যায়ক্রমে ইতালি, জার্মানি ও জাপানের পরাজয় ঘটে। বর্তমান পাঠে যুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক বিবরণ, বিখ্যাত যুদ্ধসমূহ এবং অক্ষশক্তির আত্মসমর্পণের বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

যুদ্ধের বিস্তার ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War) বলা হয়। স্থল, জল ও অন্তরীক্ষতো বটেই, সমুদ্রগর্ভেও যুদ্ধ বিস্তৃত হয়েছিল। মারণাস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধের ব্যপ্তি, লোকক্ষয়ের বিচারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয়টি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতিতে কিছু সময় ব্যয় হলে হিটলার পোল্যান্ড দখল করে নেন। এর পর সামান্য অজুহাতে হিটলার ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করেন। শক্তিশালী আত্মরক্ষা ব্যুহ ম্যাজিনো লাইন ভেদ করে ফ্রান্স আক্রমণ কঠিন এই বিবেচনায় হিটলার ১৯৪০ সালে মে মাসে লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড আক্রমণ করলেন। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী বেলজিয়ামকে দেওয়া অঞ্চলগুলি পুনরায় জার্মানগণ দখল করে। হল্যান্ডকে পদানত করে হিটলার অতর্কিতে ফ্রান্স আক্রমণে করে। দশটি পানজার বা ট্যাঙ্ক ডিভিসন, ৩০০০ সাজোয়া গাড়ি নিয়ে ৮৯ নম্বর জার্মান পদাতিক ডিভিশন মিত্রপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে উত্তর ফ্রান্স এগিয়ে যায়। মিত্রবাহিনী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ২৭ মে থেকে ৪ ঠা জুনের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ইংরেজ ও অন্যান্য মিত্রসেনাকে ৮৫০ টি হালকা নৌযানে ফ্রান্সের ডানকার্ক বন্দর থেকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়ে জার্মান বাহিনী সমগ্র উত্তর ফ্রান্স অধিকার করে। মুসোলিনিও মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও ইতালি সংলগ্ন ফ্রান্সের কিছু অংশ দখল করে নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হাতে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর কাম্পেই-এর বনাঞ্চলে যে রেলগাড়ির মধ্যে জার্মান প্রতিনিধিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছিল, হিটলারের আদেশে সেই রেলগাড়ির কামরাটি ঠিক সেই স্থানেই আনা হয় এবং ১৯৪০ সালের ২১ জুন কামরার অভ্যন্তরে ফরাসি প্রতিনিধিগণ জার্মান সেনাপতি কাইটেলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হিটলার স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উত্তর ফ্রান্স জার্মানির অন্তর্ভূক্ত হয়। দক্ষিণ ফ্রান্সে ভিচি (Vichy) নামে একস্থান নামেমাত্র স্বাধীন ফরাসি সরকার জার্মানির তাঁবেদার হয়ে ক্ষীণ অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখলো মার্শাল পেতাঁ হন বাঁ এই পুতুল সরকারের প্রধান।

ইউরোপে হিটলারের অপ্রতিহত অগ্রগতিতে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইনের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালের ১০ মে উইনস্টন চার্চিল নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জার্মান আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্য ব্রিটেন ছিল। সমুদ্র উপকূলের বেসামরিক লোকজনকে অপসারণ করে জার্মান নৌ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি চালু করা হয়। অল্পবয়সী ইংরেজ বিমান চালকগণ শক্তিশালী লুফতওয়েফেঙ্কে (জার্মান বিমান বহর) পর্যুদস্ত করে ১৫ আগস্টের মধ্যে মোট ১৮০ টি জার্মান বিমান তারা ধ্বংস করে। বার বার ব্রিটেন আক্রমণের চেষ্টা করেও হিটলার ব্যর্থ হয়।

হিটলার ইংরেজদের আফ্রিকায় জব্দ করার ব্যবস্থা করেন। ইতালি ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ড অধিকার করে। তারা মিশর ও সুয়েজ খাল দখল করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করে। জার্মান সেনাপতি রোমেল এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইংরেজ সেনাপতি ওয়াভেল ইতালির অগ্রগতি রোধ করেন। ইংরেজ বাহিনী আবিসিনিয়া অধিকার করে নেয়।

ইতিমধ্যে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে। ইতালি গ্রিস আক্রমণ করলে ব্রিটেন গ্রিসের পক্ষ নেয়। বুলগেরিয়া তার হৃত অঞ্চলে উদ্ধারের জন্য ইতালি-জার্মানি অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। হিটলার যুগোস্লাভিয়া অধিকার করতে চাইলে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যুগোস্লাভিয়া স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই জার্মানির অনুগত থাকে। ক্রমে জার্মানি গ্রিস ও যুগোস্লাভিয়া অধিকার করে নেয়। সমগ্র ইউরোপে ব্রিটেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের যোগদান ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ। দু বছরেরও কম সময়ের পূর্বে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই চুক্তির প্রতি হিটলার কখনই শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। মতাদর্শগত বিরোধ ছাড়াও ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ও বাকুর পেট্রোলিয়ামের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি ছিল। অন্যদিকে বাল্টিক ও বলকান অঞ্চলে জার্মান অগ্রগতিকে সুনজরে না দেখলেও স্টালিন জার্মানির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলেন। কিন্তু ক্ষমতার গর্বে মত্ত হিটলারের কাছে এর কোন মূল্য ছিল না।

১৯৪১ সালের ২১ জুন কিছু উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারীর সম্মানে হিটলার এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। সকলকে বিস্মিত করে পরদিনই বিশাল জার্মান বাহিনী সেনাপতি পাউলাসের অধীনে রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে ঝটিকাগতিতে মস্কোর দিকে ছুটে যায়। উত্তরে বাল্টিক থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ৪০০ কি:মি: সীমান্ত জুড়ে রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হয়। মাত্র ২৬ দিনে জার্মান বাহিনী মস্কোর দুই-তৃতীয়াংশ দূরত্ব পার হয়ে যায়। লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ হয়। লালফৌজ পোড়ামাটির নীতি (Scorched Earth Policy) অনুসরণ করে পশ্চাদপসরণ করে। অক্টোবর মাসের গোড়ায় মস্কোও অবরুদ্ধ হয়। হিটলার সদর্পে ঘোষণা করেন, এবার চূড়ান্ত যুদ্ধের শুরু। চূড়ান্ত যুদ্ধ এটি ছিল ঠিকই, তবে জার্মান পক্ষে নয়, সোভিয়েত পক্ষে।

ইতোমধ্যে প্রবল শীতের প্রকোপে জার্মান বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। সুদূর বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। রুশ লালফৌজ জার্মানদের প্রবলভাবে বাধা দেয়। ১৯৪২ সালের প্রথম লালফৌজ লেনিনগ্রাড মুক্ত করে। সেপ্টেম্বরে শুরু হয় বিখ্যাত স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ। অসম সাহসিকতার সঙ্গে রুশ জনগণ লালফৌজের সঙ্গে একযোগে জার্মানদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নভেম্বর মাসে সেনাপতি ঝুকভের অধীনে রুশ বাহিনী জার্মানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মান সেনাপতি পাউলাস আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। রুশ জনসাধারণের অতুলনীয় বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

জাপানের যোগদান

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানি নৌ-শক্তির অভ্যুত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহের চোখে দেখে। চীনে জাপানের আগ্রাসী নীতিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করেনি। কেননা যুক্তরাষ্ট্র ইতালির সঙ্গে জাপানের মৈত্রীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপছন্দ ছিল। ১৯৩৮ সালে জাপানকে বিমান সরবরাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধ করে দেয়। ক্রমে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, লোহা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ রপ্তানিও বন্ধ হয়। জাপানে এই আশংকা দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সব ধরনের অত্যাবশ্যক দ্রব্যের রপ্তানিই বন্ধ করে দেবে। সেজন্য তার দৃষ্টি পড়ে তৈল-সমৃদ্ধ ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্দোনেশিয়ার ওপর। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ ইন্দোচীন দখল করে নেয়। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে তেল সরবরাহ বন্ধ করে।

নবনিযুক্ত জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে এক চুক্তির প্রস্তাব করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইন্দোচীন থেকে জাপানি সৈন্যের অপসারণ দাবি করে। জাপানের কাছে এই দাবি একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রতিনিধিদের মধ্যে যখন শেষ পর্যায়ের আলোচনা চলছে সেই সময় ১৯৪১ সালের ৭ ই ডিসেম্বর অতর্কিত জাপানি বিমানবহর হাওয়াই দ্বীপে পার্ল হারবার নৌ-ঘাটি আক্রমণ করে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই সঙ্গে জাপান, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একইভাবে জার্মানির

পোল্যান্ড আক্রমণ দিয়ে ইউরোপে যে যুদ্ধের সূত্রপাত, পার্লহারবারে বোমা বর্ষণের ফলে তা দূর প্রাচ্যেও বিস্তৃত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট নিরপেক্ষ থাকলেও সেখানকার জনমত মিত্রশক্তিভূক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ বিক্রি করা শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলেও ক্রমশ তা আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর ও বলকান অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস লেন্ড-লীজ আইন (Lend-Lease Act) পাশ করে যুদ্ধরত মিত্রশক্তিবর্গকে অস্ত্র সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে উত্তর আটলান্টিকের নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকটে মার্কিন রণতরী আগস্টা ও ইংরেজ রণতরী প্রিন্স অফ ওয়েলসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মধ্যে একাধিক বৈঠকের পর বিখ্যাত আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) প্রকাশিত হয়। বিশ্বশান্তি রক্ষায় অপরাপর ব্যবস্থার মধ্যে আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের উল্লেখ করা হয়। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জাহাজগুলি জার্মান ডুবোজাহাজেরম্লারা ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকলে মার্কিন নৌ-বাহিনীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। কয়েক মাস পর পার্লহারবারে জাপানি বোমা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।

ইতালির পরাজয় ঃ হিটলার ও মুসোলিনি মোটামুটি একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ও রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তির শরিক হলেও উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়েই মতের অমিল ছিল। হিটলার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেও ইতালির সে ক্ষমতা ছিল না। মুসোলিনি হিটলারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পোল্যান্ডের যুদ্ধ আঞ্চলিক যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইতালি নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু মুসোলিনি হিটলারকে বিরত করতে ব্যর্থ হন। তদুপরি ইতালির টাইরলে জার্মান অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। অতএব বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানি ও ইতালির সম্পর্ক মধুর ছিল না।

জার্মানির বিস্ময়কর সাফল্য এবং ফ্রান্সের পতন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৪০ সালে জুন মাসে হিটলার ও মুসোলিনির মধ্যে মিউনিখে এক বৈঠক হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে উভয় দেশেরই যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু দুটি প্রশ্নে আবার মতানৈক্য দেখা দেয়। প্রথমত জার্মানি ফ্রান্সকে অক্ষশক্তির অন্তর্ভূক্ত করে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল। ইতালি এতে আপত্তি করে। দ্বিতীয়ত, ইতালি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতার পক্ষে ছিল, কিন্তু জার্মানি তা মানেনি। মতবিরোধ সত্ত্বেও মিত্রতার পক্ষে ছিল, কিন্তু জার্মানি তা মানেনি। মতবিরোধ সত্ত্বেও ভূমধ্যসাগরীয় ও বলকান যুদ্ধে জার্মানি ইতালিকে সবরকম সাহায্য প্রদান করায় ইতালি জার্মানির নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সে সমর্থন করে। জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ইতালিও যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইতালিকে পরাস্ত করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে মিত্রপক্ষ তিউনিস ও রিজার্টা দখল করে নিলে আফ্রিকায় আর কোনো ইতালীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রইলো না। এর পর মিত্রপক্ষের লক্ষ্য ছিল সিসিলি। মার্কিন সেনাপতি প্যাটন ও ইংরেজ সেনাপতি মন্টগোমারির নেতৃত্বে ১০ জুলাই স্থল ও জল উভয় পথে অতর্কিত সিসিলি আক্রমণ শুরু হয়। ১৭ আগস্ট সিসিলি অভিযান শেষ হয়। দীর্ঘ যুদ্ধ, ক্রমাগত পরাজয় ও আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা মুসোলিনির বিরুদ্ধে দেশবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৪৩ সালে ২৪ জুলাই মুসোলিনিকে অপসারিত করেন। ফ্যাসিস্ট গ্রান্ড কাউন্সিলও রাজাকে সহায়তা করে। আবিসিনিয় যুদ্ধের নায়ক মার্শাল বোদেগ্লিও নতুন সরকার গঠন করেন। মুসোলিনিকে বন্দী করা হয়। কিন্তু জার্মান ছত্রীবাহিনী তাঁকে মুক্ত করে। তিনি জার্মান অধিকৃত উত্তর ইতালিতে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধান হন। ১৯৪৩ সালের

সেপ্টেম্বরে মার্কিন সেনাপতি ক্লার্ক পশ্চিম ইতালি অধিকার করেন। ইংরেজ বাহিনী পূর্ব দিক থেকে ইতালি আক্রমণ করে। ১৯৪৪ এর জুনে রোম মিত্রপক্ষের হস্তগত হয়। ১৯৪৫ সালে মিত্রবাহিনী উত্তর ইতালি আক্রমণ করলে আবার ইতালিতে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। মুসোলিনি সুইজারলান্ডে পলায়নের চেষ্টা করলে ধৃত হন ও তাঁকে হত্যা করা হয়। ইতালি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে।

ইউরোপে মিত্রশক্তির আক্রমণ

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে পশ্চিম ইউরোপের যে কোনো স্থানে মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু দু'বছর কেটে গেলেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, যদিও স্টালিন এই মর্মে বার বার অনুরোধ করে যান। এই বিলম্বের কারণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মত শক্তি ছিল না। কেউ কেউ মনে করেন মিত্রপক্ষ এইভাবে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু রুশ বাহিনী নাৎসিদের প্রতিহত করে একেবারে জার্মান সীমান্ত পর্যন্ত বহিষ্কার করলে জার্মানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের কৃতিত্ব যাতে স্টালিন দাবি করতে না পারেন সেইজন্য বিলম্বে হলেও ধুরন্ধর চার্চিলা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে রাজি হন। অবশ্য এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে যখন স্টালিন, চার্চিল ও রুজলেন্ট তেহরানে এক বৈঠকে মিলিত হন।

কোন স্থানে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে তা নিয়ে বিভিন্ন মত ছিল। চার্চিল ইতালি অথবা বলকান অঞ্চল দিয়ে জার্মানিতে প্রবেশের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মূলত মার্কিন সেনাপতিগণ কষ্টসাধ্য হলেও সাগর পার হয়ে পশ্চিম ইউরোপে সেনা অবতরণের পক্ষপাতি ছিল। এ কারণে উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের নরমান্ডিকে বেছে নেওয়া হয়। প্রথম ৩৬ ডিভিশন সেনা অবতরণ করবে, পরে আরও ১০ ডিভিশন দক্ষিণ ফ্রান্সে নামানো হবে। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রায় ১০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বিমান এতে অংশ নেবে, যুদ্ধ-জাহাজ ও বিভিন্ন পরিবহন যানের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত হাজার। মিত্র পক্ষের সেনাবাহিনীতে আমেরিকান, ইংরেজ, কানাডীয়, ওলন্দাজ, পোল নরওয়েজিও, ফরাসি ও গ্রিক সৈনিক ছিল। ডি দিবস (D Day) বা অবতরণ দিবসের দিন ধার্য হয় ১৯৯৪ সালের ১ জুন। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য পিছিয়ে ৬ জুন করা হয়। এই সুবিশাল সামরিক অভিযানের নেতা ছিরেন আমেরিকান সেনাপতি আইজেনহাওয়ার।

জার্মানি মিত্রপক্ষের অবতরণের সম্ভাবনা অনুমান করে। দীর্ঘ চার বছর সমুদ্রতীর জার্মান অধিকারে থাকার ফলে দুর্ভেদ্য অতলান্তিক প্রাচীরে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্শাল রুন্ডস্টেড ছাড়াও হিটলার ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে এই বিশেষ দায়িত্ব নিযুক্ত করেন। কিন্তু রণকৌশল নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। স্থল, নৌ ও বিমান তিন দিক থেকেই মিত্র পক্ষ জার্মানবাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী ছিল।

অবতরণের দিন সন্ধ্যা থেকেই মিত্রপক্ষের এক হাজার বোমারু বিমান উপকূলবর্তী জার্মান প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলির ওপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে। সব রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। শেষ রাতে সেনা অবতরণ শুরু হয়। পশ্চিমে মন্তবুর্গ থেকে পূর্বে শেন পর্যন্ত কঁত তিঁন উপদ্বীপের ৯৬ কি:মি: জুড়ে মোট পাঁচটি স্থানে মিত্র বাহিনী নামে। এছাড়া আমেরিকান ছত্রী সৈন্য অবতরণ করে। ৪ জুন স্ত্রীর জন্মদিন ও ফুয়েরারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রোমেল বার্লিন যান। অকস্মাৎ অবতররণের সংবাদে তিনি দ্রুত ফ্রান্সে ফিরে আসেন। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। জার্মান গোয়েন্দারা উপযুক্ত সময়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারেনি। পাঁচদিন ধরে জার্মান বাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সেনার তুমুল যুদ্ধ হয়। মিত্রবাহিনী নরমান্ডি উপকূলের ১২৮ কি: মি: এলাকা অধিকার করেও ৩২ কি:মি: ভেতরে প্রবেশ করে।

'ডি ডে' বা নরমান্ডিতে মিত্রপক্ষের অবতরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পূর্ব পশ্চিম দুই সীমান্তে যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে জার্মান সেনানায়কগণ সেই বিসমার্কের সময় থেকে হুশিয়ারি দিয়ে আসছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস হিটলারের ক্ষেত্রেও এই আশংকা বাস্তবে পরিণত হলো। আগস্ট মাসে ফরাসি বাহিনী তুলো বন্দরে অবতরণ করে। তারা উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে ইউরোপে জার্মান প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। মিত্রবাহিনী দ্রুতবেগে জার্মানির দিকে এগিয়ে চলে।

জার্মানির আত্মসমর্পণ

পশ্চিম সীমন্তে মিত্রবাহিনী যখন বার্লিন অভিযানে ব্যস্ত, পূর্ব সীমান্তে তখন লালফৌজ পাঁচটি ফ্রন্টে ভাগ হয়ে দুর্বার গতিতে জার্মান সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়। প্রথম সারির রুশ সেনানায়কগণ যেমন জুকভ, কোনেভ, চেরনিয়াখোভস্কি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মার্চে লালফৌজ বার্লিন থেকে ৯৬ কি: মি: দূরে অবস্থান করছিল।

এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজ হামবুর্গ, উইটেনবর্গ ও ম্যাসাডবুর্গ বরাবর এলব নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে থেকে তারা নুরেমবার্গ স্টুটগার্টের দিকে অগ্রসরের অপেক্ষা করে বার্লিন থেকে ১০৫ কি: মি: দূরে। ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েত বাহিনীর মধ্যে এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়, কে কার পূর্বে বার্লিনে প্রবেশ করবে।

জার্মান রাজধানী রক্ষার জন্য হিটলার শহরের প্রবেশ পথে নানা রকম বাধার সৃষ্টি করেন। ওডের ও স্প্রি নদীর ধারে আগুয়ান বাহিনীর গতিরোধের উপযুক্ত অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়। তদুপরি বার্লিনের চারপাশে কিছু প্রাকৃতিক বাধাও ছিল, যেমন জলাভূমি, জঙ্গল, খাল, প্রভৃতি। ১৬ এপ্রিল শেষ রাত ৪ ঘটিকার মার্শাল জুকভ প্রচন্ড গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে বার্লিন অভিযানের উদ্বোধন করেন। ১৮ই এপ্রিল স্প্রি নদী পার হয়ে ২০ এপ্রিল রুশ সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে জোসেন আক্রমণ করে। ২১ এপ্রিল রুশ সেনা বার্লিন শহরে প্রবেশ করে ও রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জুকভ, কোনেভ ও রকোসোভস্কির সৈন্যেরস্লারা বার্লিন সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়। বার্লিনবাসীর মধ্যে চরম বিপর্যয় ও আতংকের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ক্রমশ এগুতে থাকলে এসব নদীর তীরে টোরঘাউ শহরের কাছে লালফৌজের সঙ্গে ২৫ এপ্রিল তাদের দেখা হয়। তখন থেকেই ফ্যুয়েরারের 'হাজার বছরের রাইখে'র স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

বার্লিনের উপর রুশ আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই চ্যান্সেলারির ৫০ ফুট ভূগর্ভের নীচে বিশেষভাবে নির্মিত ব্যাংকারে হিটলার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সেখানে গোয়েবলস প্রমুখ ঘনিষ্ট দলীয় সহকর্মী, ডাক্তার ও পরিচালকও ছিলেন। হিটলারের তখন বয়স ৫৬ বছর। ১৯৪৪ সালের ২০ জুলাই বোমা বিষ্ফোরণে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হওয়ার পর থেকে তিনি একটু খুঁড়িয়ে হাটতেন ও হাত দুটো কাঁপতো। ১২ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুর খবরে তিনি পুলকিত হন। আশা করেন এইবার হয়তো যুদ্ধের মোড় ঘুরবে। কিন্তু গোয়েরিং এর ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। লাল-ফৌজের বার্লিন প্রবেশের সংবাদে নাৎসি নায়ক বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের তিনি এর জন্য দায়ী করেন। অন্তিম লগ্ন সমাগত এই উপলব্ধিতে হিটলার তাঁর রাজনৈতিক দলিল প্রস্তুত করেন।

হিটলার তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নাৎসি দলকে দিয়ে যান। দুর্লভ চিত্রকর্মের যে সংগ্রহ তার ছিল তা দান করেন জন্মভূমি ব্রাউনাউকে। গোয়েরিং ও হিমলারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। ইহুদিদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে

যেতে বলেন। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃতদেহ ব্যাংকারের বাইরে চ্যান্সেলারির উদ্যানে সম্পূর্ণভাবে দাহ করা হয়। গোয়েবলসও সপরিবারে আত্মহননের পথ বেছে নেন।

হিটলারের উত্তরাধিকারী অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস রুশ সেনা অপেক্ষা মিত্র পক্ষের কাছেই আত্মসমর্পণ সুবিধাজনক বলে মনে করেন। কিন্তু তা হয়নি। ১৯৪৫ সালের ৯ মে শেষরাতে জার্মান প্রতিনিধিবর্গ মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর ফ্রান্সের রেইমস শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চারটি দেশের চারটি পৃথক দলিলে জার্মানগণ স্বাক্ষর করে। এই অনুষ্ঠানে চার পক্ষের সেনাপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। জার্মান প্রতিনিধি ফিল্ড মার্শাল জড্‌ল বিজয়ী পক্ষের কাছ থেকে উদার ব্যবহারের আশা ব্যক্ত করেন।

পরদিন ৪ মে, বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি কলেজ ভবনে আত্মসমর্পণের মূল চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেন যথাক্রমে মার্শাল জুকভ, সেনাপতি কার্ল-স্পাজ, মার্শাল টেডার ও সেনাপতি তাসিনি। জার্মান পক্ষে স্বাক্ষর করেন ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ফ্রেডবুর্গ ও সেনাপতি স্টাফ। এই অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপীয় অংশের অবসান হলো। দূর প্রাচ্যের রণভূমি তখনও উত্তাল ছিল।

জাপানের আত্মসমর্পণ

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপানি বিমান বহর পার্ল হারবার নৌঘাটি ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গেই দূর প্রাচ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিস্তৃত হয়। তারা ফিলিপাইনসে মার্কিন বিমানবাহিনীও নিশ্চিহ্ন করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অসংখ্য দ্বীপসহ হংকং, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন তারা অধিকার করে নেয়। মালয় ও ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) তারা অধিকার করে।

১৯৪২ সালের মে মাস থেকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে থাকে। মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে মার্কিন বিমান আক্রমণে জাপানি নৌবহর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪৩ সালে উয়াদাল কানাল, নিউগিনি মিত্রপক্ষ দখল করে। এ ঘটনার পর দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়ে মিত্রপক্ষ একে একে ফিলিপাইনস, গিলবার্ট ও মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ উদ্ধার করে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জও মিত্রপক্ষ অধিকার করে নেয়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানি সেনার সহায়তায় বার্মা থেকে মণিপুর পর্যন্ত এগিয়ে আসে ভারতের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অন্যত্র জাপানিগণ পরাজিত হয়ে থাকায় এই লক্ষ্য বিফল হয়।

জার্মানির আত্মসমর্পণ ও কিনাওয়ার পতনের পর জাপান পিছু হটতে থাকে। ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসুডাম সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণের আহবান জানায়। মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী জাপানের বিভিন্ন শহরে বিমান হামলা অব্যাহত রাখে।

অন্যদিকে ১৯৪১ সালে রুশ-জাপান নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল করে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে ৬ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ৪ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। ৯ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ব্যবহার করলে জাপানের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকলো না।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর মার্কিন রণতরী 'মিশৌরীতে জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে । দূর প্রাচ্যে মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতি ম্যাকআর্থারের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিগেমিৎসু আত্মসমর্পণ ও সেনাপতি উমেজু দলিলে স্বাক্ষর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইংল্যান্ড চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড, ফরাসি ও সোভিয়েত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। মঞ্চুরিয়াতেও জাপানি বাহিনী

পরাভূত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পন করে। এই ভাবে দূর প্রাচ্যেও বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়-
(ক) ১৯৩৯ সালে (খ) ১৯৪০ সালে (গ) ১৯৪১ সালে (ঘ) ১৯৪২ সালে

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রান্সের পুতুল সরকারের নাম কি ?
(ক) দ্যগল (খ) মার্শাল পেতা (গ) জ্যাক মিরাক (ঘ) এর্ডওয়ার্ড বালাদুর

৩। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন ১৯৪১ সালের-
(ক) ২০ জুন (খ) ২১ জুন (গ) ২২ জুন (ঘ) ২৩ জুন

৪। ডি ডে হচ্ছে-
(ক) অবতরণ দিবস (খ) পলায়ন দিবস (গ) আক্রমণ দিবস (ঘ) যুদ্ধ বিরতি দিবস

উত্তর ১। (ক) ২। (খ) ৩। (গ) ৪। (ক)

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক বিস্তার (সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত) সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান পরিস্থিতির মোড় কতটুকু ঘুরাতে পেরেছিল?

৩। দূরপ্রাচ্য এবং ইউরোপে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।
৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তির আত্মসমর্পণের বিষয়টি বর্ণনা করুন।

পাঠ - ২

যুদ্ধকালীন কূটনীতি ও বিভিন্ন সম্মেলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি−

- যুদ্ধকালীন কূটনীতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- আটলান্টিক ও তেহরান সম্মেলন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ইয়াল্টা সম্মেলন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পটস্‌ডাম সম্মেলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ এবং ৭ ডিসেম্বর জাপানের মার্কিন নৌঘাঁটি পার্লহারবারে বোমাবর্ষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অভূতপূর্ব মৈত্রী বন্ধনের সৃষ্টি করে। তারা জার্মানি-ইতালি-জাপান এই অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ায়। ফলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। এই যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তিবর্গের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। রণকৌশল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বের পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ এ সকল সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। এই সম্মেলনগুলোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। মিত্রশক্তির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকগুলো সম্মেলন হয়েছিল। এগুলো হলো আটলান্টিক সম্মেলন (১৯৪১ ও ৪২), মস্কো সম্মেলন (১৯৪২), কাসাব্লাংকা সম্মেলন (১৯৪৩),

তেহরান সম্মেলন (১৯৪৩), ইয়াল্টা সম্মেলন (১৯৪৫), পটস্ডাম সম্মেলন (১৯৪৫) ইত্যাদি। এসব সম্মেলনের মধ্যে মোট চারটি সম্মেলন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এসব সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

এক. আটলান্টিক সম্মেলন

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরের নৌবহরে মিলিত হয়ে আটটি শর্ত বিশিষ্ট শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। অতপর দুদেশের রাষ্ট্রপ্রধান মিলিতভাবে একটি ঘোষণা দেন যা আটলান্টিক চার্টার নামে খ্যাত। এতে বলা হয় যে, সকল জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও রাষ্ট্রীয় সীমানা সম্পর্কে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে বাক স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং অনাহার ও ভীতি থেকে মুক্তির আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন। সমুদ্রপথে অবাধ যাতায়াত, পররাজ্য গ্রাস নীতির অবসান, নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উচ্চ আদর্শের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ১৯৪২ সালে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে আটলান্টিক চার্টারের উল্লেখিত নীতি ও আদর্শকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পরে আরও ২২টি দেশ এতে স্বাক্ষর করলে মোট সংখ্যা ২৬-এ উন্নীত হয়। এই ঘোষণা জাতিসংঘ ঘোষণা (United Nations Declaration) নামেও খ্যাত। কারণ জাতিসংঘ বা United Nations কথাটি এ সম্মেলনের ঘোষণাপত্র থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

দুই. তেহরান সম্মেলন

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে পারস্যের (বর্তমান ইরান) রাজধানী তেহরানে মিত্র পক্ষের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই এর গুরুত্ব অনেক। সামরিক ক্ষেত্রে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। ইতোপূর্বে আগস্ট মাসে কানাডার কুইবেকে অ্যাংলো-আমেরিকান সম্মেলনে উত্তর ইউরোপে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে অপারেশন ওভারলর্ড (Operation Overlord) নামে যে সামরিক আক্রমণ পরিচালনার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়– এ সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে তা অনুমোদিত হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক থেকেও আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় যে, স্ট্যালিন ও চার্চিলের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি ও সন্দেহ এখানে পরিদৃষ্ট হয় এবং রুজভেল্ট তাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তেহরানের সম্মেলনের মূল্যায়ন

তেহরান সম্মেলনে যদিও যুদ্ধোত্তর মীমাংসার ভিত্তি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে তথাপি কোনো বাস্তব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজে রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সমর্থন আদায়ের জোর প্রচেষ্টা চালান। রুজভেল্ট, স্ট্যালিন ও চার্চিল যুদ্ধোত্তর জার্মানির ভবিষ্যত নিয়েও আলোচনা করেন। তারা একমত হন যে, জার্মানিকে খণ্ড বিখণ্ড করা হবে। কিন্তু, কীভাবে তা করা হবে সে বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। পোল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। রাশিয়া কার্জন লাইন (The Curzon Line) এমনভাবে দেখানোর চেষ্টা করে যাতে লভভ (Lvov) রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। রুজভেল্ট ও চার্চিল স্বীকার করে নেন যে, পশ্চিম দিকে পোল্যান্ড সরে যাবে। ফলে পূর্বদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ডের কিছু অংশ পাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমি লাভের প্রশ্নেও পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ কিছুটা নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের পুরস্কার হিসেবে তার ভৌগোলিক প্রয়োজন মিটাতে রাজি ছিলেন। সবশেষে স্ট্যালিন যখন ফিনল্যান্ডের যুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্যে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাহায্য চান, তখন যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বিপুল হবে এ অজুহাতে রুজভেল্ট ও চার্চিল বিষয়টির বিরোধিতা করেন।

তিন. ইয়াল্টা সম্মেলন

বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম প্রজাতন্ত্র এবং বর্তমান ইউরোপীয় দেশ ইউক্রেনের স্বাস্থ্য নিবাস হচ্ছে ইয়াল্টা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এখানে তিন প্রধান (The Big Three) অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এফ.ডি. রুজভেল্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের যোশেফ স্ট্যালিন এবং বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উনস্টন এস চার্চিলের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধকালীন সম্মেলনগুলোর মধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা পরবর্তীকালের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল। এখানেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রূপরেখা প্রণয়ন এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। এখানে ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্যে চারটি মৌল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সিদ্ধান্ত হচ্ছে–

(১) জার্মানি সংক্রান্ত
(২) পোল্যান্ড সংক্রান্ত
(৩) দূরপ্রাচ্য সংক্রান্ত
(৪) জাতিসংঘ সংক্রান্ত।

এ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন দুজন। একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এফ.ডি রুজভেল্ট অন্যতম সোভিয়েত নেতা যোশেফ স্ট্যালিন। পরবর্তীকালে গবেষণায় দেখা গেছে যে, রুজভেল্ট নমনীয় ও উদার মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অন্যদিকে তার প্রতিপক্ষ স্ট্যালিন অত্যন্ত একরোখা ও অনমনীয় প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। ফলে দেখা যায় যে, ইয়াল্টা সম্মেলনে সোভিয়েত স্বার্থ প্রতিফলিত হয়েছিল বেশি। অনেক পশ্চিমা ঐতিহাসিক মনে করেন যে, স্ট্যালিনের একরোখা মনোভাবস্নারাই ইয়াল্টা সম্মেলন প্রভাবিত হয়েছিল। রুজভেল্ট কেন নমনীয় ছিলেন এর উত্তরে অনেক গবেষক বলেছেন যে, রুজভেল্ট ছিলেন ডেমোক্রেট দলের সদস্য যারা ঐতিহ্যগতভাবে উদারপন্থী।

উইলিয়াম চেম্বার লিনের মতে, ইয়াল্টা সম্মেলন ছিল সোভিয়েত কূটনীতির ব্যাপক সফলতার একটি দৃষ্টান্ত এবং একই সাথে মার্কিন তোষণনীতির একটি প্রমাণ।

ইয়াল্টা সম্মেলনের মূল্যায়ন

(ক) প্রথম সিদ্ধান্ত ঃ অক্ষ শক্তির পরাজয়ের সূচনা হয়েছিল পূর্ব দিক থেকে। পূর্ব ইউরোপ তখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে। তখন একে বলা হতো স্বাধীন ইউরোপ বা (Liberated Eurpoe), যুদ্ধের পর স্বাধীন ইউরোপে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হবে। এই গণতন্ত্রের রূপ কি হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এটা কি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, না সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র সেটাই ছিল প্রশ্ন। এ রহস্যময়তা বা অস্পষ্টতার কারণে ১৯৪৫ সালের পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের একচ্ছত্র প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো এ ব্যবস্থাকে নির্বাচনহীন এবং একনায়কতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে।

(খ) দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ঃ ইয়াল্টাতে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল পোল্যান্ড নিয়ে এবং এর পিছনে অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। পোল্যান্ডের রাজনৈতিক ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে স্টালিন অঙ্গীকার করলেন যে, পোল্যান্ডে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে এবং সেখানে কিছু অ-কমিউনিস্ট সদস্য নেওয়া হবে। রুজভেল্ট এই বক্তব্য মেনে নেন।

(গ) তৃতীয় সিদ্ধান্ত ঃ রুজভেল্ট এবং চার্চিলের বক্তব্য ছিল স্ট্যালিনের কাছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্যে Operation Overlord করা হয়েছিল, তাই এখন স্ট্যালিনের উচিত দূরপ্রাচ্য আক্রমণে তাদেরকে সাহায্য করা। একা মিত্রশক্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপানকে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাই জার্মানির মতো দুদিক থেকে জাপান আক্রমণ করেই তাকে পরাভূত করা সম্ভব হবে। বলা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি জাপান আক্রমণ করে তবে তাকে

পুরষ্কার হিসেবে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার কিছু অংশ দেওয়া হবে। স্ট্যালিন জার্মানির আত্মসমর্পণের দুই-তিন মাসের মধ্যে জাপানে আক্রমণে সম্মত হন।

(ঘ) চতুর্থ সিদ্ধান্ত ঃ জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে জার্মানিকে চারভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যেকের অধীনে একটি করে অংশ থাকবে এবং তখন তারা ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। প্রাথমিক আলোচনার পর নেতৃবৃন্দ মস্কোতে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি কমিশন (Reparation Commission) স্থাপনে সম্মত হন।

(ঙ) পঞ্চম সিদ্ধান্ত ঃ জাতিসংঘ বিষয়ক দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। এগুলো হলো–

এক. ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে একটি মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন শীর্ষ নেতারা। বলা হলো যে, প্রস্তাবিত জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য থাকবে এবং তাদের অনুমোদন ছাড়া বিশ্ব শান্তি ও নিরপত্তার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। পরবর্তীকালে এটাকে বলা হয়েছে ভেটো শক্তি (Veto Power)। এ সম্মেলনে স্ট্যালিন নিরাপত্তা পরিষদের সকল প্রস্তাবে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের দাবি প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। স্থির হয় যে, কেবলমাত্র অপ্রণালীগত প্রস্তাবে যেমন বিশ্বশান্তি রক্ষা, যুদ্ধ বন্ধ ইত্যাদি প্রশ্নে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে।

দুই. এ সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ১৫টি প্রজাতন্ত্রকে সদস্যপদ প্রদানের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আপোষ প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বাইলোরুশ ও ইউক্রেন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন ও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে প্রজাতন্ত্র দুটোকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়।

পূর্ব ইউরোপ ও জার্মানি সংক্রান্ত যে বিভক্তি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা পরবর্তীকালে স্নায়ুযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। যদিও ইয়াল্টা সমঝোতাকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করা হয় তথাপি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পথে ইয়াল্টা সম্মেলনকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই পটস্ডাম সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই সম্মেলনে স্ট্যালিন, চার্চিল, এ্যাটলি এবং প্রেসিডেন্ট ট্যুম্যান যোগ দেন। এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর এই প্রথম ট্রুম্যান মার্কিন প্রতিনিধি হিসেবে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। অন্যদিকে ব্রিটেনে নির্বাচনে জিতে চার্চিলের পরিবর্তে এ্যাটলি নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় সম্মেলনের বাকি দিনগুলোতে এ্যাটলি যোগ দেন। স্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুযায়ী ট্রুম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পটসডাম সম্মেলনে জার্মানি, পোল্যান্ড ও পূর্বইউরোপ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(ক) জার্মানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

মিত্রশক্তি জার্মানির প্রতি কী ধরনের নীতি অনুসরণ করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তব সুবিধার জন্যে রাজনৈতিক নীতিকে অর্থনৈতিক নীতি থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। মিত্রশক্তি কীভাবে জার্মানি দখল করবে তার একটি রাজনৈতিক নির্দেশাবলী ইউরোপীয় উপদেষ্টা কমিশন তৈরি করে এবং এ বিষয়ে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়। জার্মানি দখলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়–

(১) জার্মানির সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও অসামরিকীকরণ এবং সামরিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব কলকারখানার অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা হবে;

(২) জার্মানির জনগণকে জানিয়ে দেওয়া যে, তারা একটি চরম সামরিক পরাজয় বরণ করেছে এবং তারা যা করেছে তার দায়িত্ব তারা এড়াতে পারে না;

(৩) নাৎসি দল এবং এর সহযোগী সংগঠন ও সংস্থাকে ধ্বংস করা। সকল নাৎসি প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া যাতে কোনো সময় এগুলো আর পুনরুজ্জীবিত না হয়। জার্মানির সামরিক কার্যকলাপ এবং প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হবে;

(৪) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জার্মানির রাজনৈতিক জীবন পুনর্গঠিত করা হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানিকে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

পট্সডাম সম্মেলনে মিত্রশক্তি জার্মানির অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপারে একমতে পৌঁছান যে, জার্মানির অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এতে জার্মানির যুদ্ধ করার ক্ষমতা দুর্বল হবে। আরো বলা হয় যে, মিত্র শক্তির দখলে থাকাকালীন জার্মানিকে একটি অখণ্ড একক হিসেবে গণ্য করা হবে। ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ক্ষতিপূরণ এমনভাবে আদায় করা হবে যাতে, বিদেশি সাহায্য ছাড়া জার্মান জনগণের জীবিকা নির্বাহের সম্পদ অবিশিষ্ট থাকে। আরো বলা হল যে, জার্মানির জনগণের জীবনযাত্রার মান যেন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের জনগণের জীবনযাত্রার মানকে অতিক্রম না করে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জার্মানির কাছ থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছিল।

(খ) অন্যান্য সিদ্ধান্ত

(১) অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে চারটি সামরিক অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত।

(২) পোল্যান্ডের সীমানা ক্ষুদ্র ইউরোপীয় শক্তির সাথে শান্তি চুক্তির খসড়া সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

পটস্ডাম সম্মেলনের মূল্যায়ন

পটসডাম সম্মেলনে জার্মানি সম্পর্কে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাতে কোনো বাদানুবাদ হয়নি। কিন্তু ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির তীব্র বাদানুবাদ হয়। পটস্ডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় বিষয়াবলীর সমাধানের ব্যাপারে এসব সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান দিতে পারেনি। এ সিদ্ধান্তগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানিতে এবং ইউরোপের অন্যত্র জঙ্গি মতবাদস্লারা পরিচালিত সরকারের অবসান করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে এই গণতন্ত্রের রূপরেখা গণতান্ত্রিক না সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সংগঠিত হবে সে বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মতবিরোধ দেখা দেয়। আর এভাবেই সূচনা হয়স্নায়ু যুদ্ধের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (|) চিহ্ন দিন।

১। আটলান্টিক চাটারে স্বাক্ষর করে কয়টি দেশ?
(ক) ১০টি (খ) ১৫টি
(গ) ২০টি (ঘ) ২৬টি।

২। তেহরান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের−
(ক) সেপ্টেম্বর মাসে (খ) অক্টোবর মাসে
(গ) নভেম্বর মাসে (ঘ) ডিসেম্বর মাসে।

৩। ইয়াল্টা কোন দেশের স্বাস্থ্য নিবাস−
(ক) ব্রিটেন (খ) ইউক্রেন
(গ) রাশিয়া (ঘ) জাপান।

৪। ইয়াল্টা সম্মেলন সোভিয়েত ফেডারেশনের দেশগুলো জাতিসংঘের কয়টি সদস্যপদ দেওয়া হয়−
(ক) ৩টি (খ) ৬টি
(গ) ৯টি (ঘ) ১৫টি।

৫। পটসডাম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন−
(ক) স্ট্যালিন (খ) ট্রুম্যান
(গ) রুজভেল্ট (ঘ) এ্যাটলী।

উত্তর ১। (ঘ) ২। (গ) ৩। (খ) ৪। (ক) ৫। (খ)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আটলান্টিক ও তেহরান সম্মেলন সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।
২। ইয়াল্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করুন।
৩। পটস্ডাম সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। W.S. Churchi II ; The Second World War.
২। R.O. Paxton ; Europe in the Twentieth Century
৩। ই,এইচ,কার ; দুই মহাযুদ্ধের অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস (বাংলা একাডেমি)
৪। অসিত কুমার সেন ; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

পাঠ - ৩

জাতিসংঘ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- জাতিসংঘের উৎপত্তির পটভূমি জানতে পারবেন;
- জাতিসংঘের উৎপত্তির পটভূমি জানতে পারবেন;
- জাতিসংঘের গঠন কাঠামো এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জাতিপুঞ্জ এবং জাতিসংঘের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবেন;
- জাতিসংঘের সাফল্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

একটি বিশ্ব সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফলে সংগঠনটির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের ভয়াবহতা অবলোকন করে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনেকেই এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সর্বাত্মক ধ্বংস এবং অপমৃত্যু অনিবার্য। যুদ্ধক্লান্ত বিশ্ববাসীও অধীর আগ্রহে একটি কার্যকর বিশ্ব সংগঠনের প্রার্থনা করতে থাকেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেসব সংগঠনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই নিরন্তর প্রচেষ্টা চালান। বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলনের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন সংগঠন স্থাপন করে সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। চার বছরের উদ্যোগ ও আয়োজনের পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের উৎপত্তির পটভূমিঃ বিভিন্ন সম্মেলন

হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ ও দূরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বিরোধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাধারণ চরিত্রে পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন। নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের কাছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অগাস্টা ও প্রিন্স অফ্ ওয়েলস রণতরীতে দুই রাষ্ট্রনেতা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। দিনটি ছিল ৯ আগস্ট ১৯৪১। যুদ্ধের লক্ষ্য ও নীতি বিশদ আলোচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধরোধে ও আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখতে এমন কিছু ইঙ্গিত এই বৈঠকে ছিল, বলা যেতে পারে যার মধ্যে ভবিষ্যতের জাতিসংঘের (United Nations Organisation) ইঙ্গিত ছিল। আটলান্টিক সাগরের এই বৈঠকে গৃহীত নীতিগুলি আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) নামে ইতিহাসে পরিচিত।

আটলান্টিক সনদ

আটলান্টিক সনদের তৃতীয় দফায় সুস্পস্টভাবে সমস্ত দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্ব, সায়ত্বশাসন ও জাতীয় সত্ত্বা পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস দেওয়া হয়। অবশ্য রক্ষণশীল ও ঘোর সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল এই ঘোষণার আওতা থেকে ভারত, বার্মা ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যকে বাদ দেন। তদুপরি এই সনদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিবাদের সমাধান প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়।

আটলান্টিক সনদ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের দ্বিপাক্ষিক গোপন আলোচনার ফসল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র (United Nations Declaration) স্বাক্ষরিত

হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমে এতে স্বাক্ষর করে। পরে আরও বাইশটি দেশ এটি অনুমোদন করে। আটলান্টিক সনদকে নীতিগতভাবে এই ঘোষণাপত্রে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্রয় কার্ডেল হাল, আন্টনি ইডেন ও মলোটভ বিশ্বের সব শান্তিকামী দেশের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংস্থারস্নার উন্মুক্ত রাখার আহ্বান জানান।

এরপর তেহরান সম্মেলন (১৯৪৩) জাতিসংঘের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৪ সালের ওয়াশিংটনস্থ ডাম্বারটন ওকসের বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ জাতিসংঘের রূপরেখা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। এই বৈঠকে ভেটো (Veto) বা নিরাপত্তা পরিষদে একক বিরোধিতায় কোনো প্রস্তাব নাকচ করার অধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অন্তর্ভুক্ত সব প্রজাতন্ত্রের জন্য পৃথক ভোটাধিকার দাবি করায় সমস্যা দেখা দেয়। এখানেই স্থির হয় যে, জাতিসংঘের কাঠামো, উদ্দেশ্য, আইনবিধি প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য অদূর ভবিষ্যতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হবে। ১৯৪৫ সালে ইয়াল্টা সম্মেলনের রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন স্থির করেন যে, পরবর্তী ২৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্কোতে এক সম্মেলন আহ্বান করা হবে যেখানে প্রস্তাবিত জাতিসংঘের একটি সনদ (Charter) প্রণীত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কর্মব্যস্ত সানফ্রানসিস্কো শহরে সারাবিশ্বের মোট ৫১টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এক মহাসম্মেলনে মিলিত হন। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুংখানুপুঙ্খ ও বিশদ আলোচনার পর জাতিসংঘের উদ্দেশ্য, নীতি, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাঁচটি বৃহৎশক্তির ভেটো দেওয়ার অধিকার, আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা, অছি (Trustee) সংক্রান্ত সমস্যা প্রভৃতি প্রশ্নে কিছু জটিলতা দেখা দেয়। বিস্তারিত আলোচনার পর ভেটো গ্রাহ্য হয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকরী করার সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়, জাতিসংঘের অধীনে পৃথক অছি পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১১১টি ধারা সম্বলিত জাতিসংঘের সনদটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জাতিসংঘ সনদ

প্রস্তাবনায় বলা হয়, ভাবী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা ও মৌলিক মানব অধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে জাতিসংঘ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বৃহত্তর স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে সামাজিক অগ্রগতি, উন্নততর জীবনযাত্রার মান, জাতিতে জাতিতে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা জাতিসংঘের লক্ষ্য। সব জাতির সমান অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহাবস্থান বৃদ্ধি করা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে যুদ্ধ পরিহার করে সনদ নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার অঙ্গীকার করে। সনদ লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ শাস্তি দেওয়ার অধিকারী ও সদস্য রাষ্ট্রবর্গ তা সমর্থন করবে। সাধারণ অবস্থায় কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ না করলেও বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জাতিসংঘের এই অধিকার নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংগঠনগুলিকে জাতিসংঘ প্রয়োজনবোধে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। জাতিসংঘের সনদে উল্লিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে যে সব শান্তিকামী রাষ্ট্র ইচ্ছুক তাদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তবে কোনো রাষ্ট্রের যোগ্যতা বিচারে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ও সাধারণ পরিষদের মনোনয়ন প্রয়োজন। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ও সাধারণ পরিষদের সম্মতিতে অনুরূপভাবে কোনো রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাতিলও হতে পারে।

সংগঠন ও উদ্দেশ্য

সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে গৃহীত সনদ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন বসে। মোট ছটি সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘের সংগঠন গড়ে ওঠে। এইগুলি হলো (১) সাধারণ পরিষদ (General Assembly) (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) (৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council) (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) ও (৬) দপ্তর (Secretariat)

সাধারণ পরিষদ ঃ সব সদস্য রাষ্ট্রকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে যদিও এক রাষ্ট্রের এক ভোট। সাধারণ পরিষদ প্রতি বছর একজন সভাপতি নির্বাচন করবে। এছাড়া তের জন সহসভাপতি ও সাতজন স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবে। সাধারণ পরিষদ কর্তব্য সম্পাদানের জন্য অন্য আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। এগুলো হল রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি, অর্থনীতি সংক্রান্ত কমিটি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি, শাসনতান্ত্রিক ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কমিটি, আইন সম্পর্কিত কমিটি প্রভৃতি।

কার্যাবলী ঃ

সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বছরে একবার করে আহ্বান করা হয়। তবে অধিকাংশ সদস্যের অনুরোধে কোনো বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা যাবে। বিশ্বশান্তির স্বার্থ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সাধারণ পরিষদ আলোচনা ও সুপারিশ করবে। সাধারণ পরিষদে কোনো সমস্যার আলোচনা ও বিতর্ক বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। মানবাধিকার সম্পর্কি আলোচনাও এর কর্তব্য। বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক মতবিরোধের ফলে ও ভেটো ব্যবস্থার জন্য অনেক সময় নিরাপত্তা পরিষদে অচলাবস্থা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ হস্তক্ষেপ করে মীমাংসার ব্যবস্থা করতে পারে। জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলি তাদের কার্যবিবরণী সাধারণ পরিষদের কাছে পেশ করবে।

নিরাপত্তা পরিষদ ঃ জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী নিরাপত্তার পরিষদ। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ও দশজন অস্থায়ী সদস্য (পূর্বে ছিল ছয়) নিয়ে এই পরিষদ গঠিত। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সমাজতন্ত্রবাদী চীন (পূর্বে ছিল তাইওয়ান)। অস্থায়ী সদস্যগণ দু'বছরের জন্য পর্যায়ক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে একবার এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে একবার এ নিয়ে বাংলাদেশ দু'বার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

নিরপত্তা পরিষদের প্রধান কর্তব্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এমন যে কোনো বিষয়ে পরিষদ তদন্ত করতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা মধ্যস্থতা, বিচার অথবা উপযুক্ত যে কোনো শান্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন পরিষদের ক্ষমতাভুক্ত। শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা পরিষদের আছে। এই শান্তিমূলক ব্যবস্থা দু'রকম হতে পারে-অর্থনৈতিক বয়কট ও সামরিক হস্তক্ষেপ। সাধারণ পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্বও নিরাপত্ত পরিষদের।

সাধারণত ঃ গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর থেকে ভেটো ব্যবস্থার সৃষ্টি। এরদ্বারা যে কোনো একজন স্থায়ী সদস্যের অসম্মতিতে কোনো প্রস্তাব খারিজ হয়ে যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে ভেটো ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক মনে হলেও কোনো আন্তর্জাতিক সদস্যার সমাধানে বৃহৎ রাষ্টবর্গের একমত হওয়ার প্রয়োজনীতার ওপর এরদ্বারা গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ কোনো বৃহৎ শক্তির মতের বিরুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা হলে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বৃহৎ শক্তিগুলিরও সংকীর্ণ স্বার্থে এই অধিকার প্রয়োগ না করার দায়িত্ব থাকে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ:কার্যাবলী

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু অগ্রগতি। জাতিসংঘের সনদেও মানবজাতির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করে মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের অঙ্গীকারও সনদে স্বীকৃত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সৃষ্টি করা হয়। সাধারণ পরিষদ তিন বছরের মেয়াদি ১৮ জন সদস্যকে এই পরিষদে নির্বাচন করে।

পরিষদের প্রধান কাজগুলি হল (১) সদস্য রাষ্ট্রগুলির সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ জন-কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সাধারণ পরিষদকে এই মর্মে অবহিত করা। (২) সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে ন্যূনতম মানব অধিকার অর্থাৎ মৌলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। (৩) পরিষদের অধীনস্থ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা।

পরিষদের অধীনস্থ সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (ILO), আন্তর্জাতিক অর্থ-ভান্ডার (IMF), প্রভৃতি। এছাড়া ইউরোপের জন্য নিযুক্ত অর্থনৈতিক কমিশন (EEC), এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জন্য নিযুক্ত কমিশন (ECAE) ও ল্যাটিন আমেরিকার জন্য কমিশন (ECLA) উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক স্তরে শিশু বিকাশের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এক জরুরি তহবিল (UNICEF), ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রশাসন (UNRRA)।

অছি পরিষদ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে অধিকাংশ ঔপনিবেশিক শাসনেরই অবসান হয়েছে। এখনও যারা পরাধীন ও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ তাদের রাখা হয়েছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অছি পরিষদের শাসনাধীনে। সনদে বলা হয়েছে যে, অছি ব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন করে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া।

কার্যাবলী

জাতিপুঞ্জ বা লীগের অধীনস্থ ম্যানডেট অঞ্চলসমূহ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে অক্ষশক্তির হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলি অছি পরিষদের দায়িত্বে রাখার ব্যবস্থা হয়। ম্যান্ডেট ব্যবস্থায় পূর্বতন অটোমান বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল কয়েকটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ম্যান্ডেট অঞ্চলগুলির ওপর পরিদর্শন ক্ষমতা সেখানকার অধিবাসীদের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু অছি ব্যবস্থায় এর সুযোগ আছে।

অছি অঞ্চলগুলি অধিকাংশই আফ্রিকায় অবস্থিত- যেমন, ইংরেজ ও ফরাসি টোগোল্যান্ড, ফরাসি ক্যামেরুন, ইতালীয় সোমালিল্যান্ড, টাঙ্গানাইকা, রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি প্রভৃতি। জাতিসংঘে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় আছি অঞ্চলগুলির সুশাসন ও দ্রুত স্বাধীনতার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যবর্গ ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত হওয়ার নিয়ম রাখা হয়। ষাট ও সত্তরের দশকের পর স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থানের পর অছি অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়, ফলে অছি পরিষদও কার্যত গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক বিচারলয় ঃ সানফ্রানসিস্কোতে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে এই বিচারালয়ের সৃষ্টি হয়। পরে চুক্তিটি সনদে সন্নিবেশিত করা হয়। জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ আন্তর্জাতিক বিচালালয়ের তুলনায় এই বিচারালয় আরও বড় ও উন্নতমানের হয়। আইনজ্ঞ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিজের দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে এখানে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্তির সময় বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা ও আইন ব্যবস্থার প্রতিফলন হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। সাধারণ

পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিচারকগণ নিযুক্ত হন নবছরের জন্য। বিচারকের সংখ্যা ১৫ জন। জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সদস্য। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা, সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিবাদের মীমাংসা, বিশেষজ্ঞ সমিতিগুলিকে আইনগত পরামর্শদান প্রভৃতি বিচারালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। দি হেগে এর কার্যালয় অবস্থিত।

দপ্তর ঃ

জাতিসংঘের সনদে বলা হয়েছে যে, একজন মহাসচিব (Secretary General) ও সাংগঠনিক কর্মীদের নিয়ে দপ্তরে গঠিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল থেকে যোগ্যতা ও সততার মানের ভিত্তিতে দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ নিযুক্ত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরকম যে কোনো ঘটনা জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচরে আনবেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সংস্থাগুলির কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দপ্তর পরিবেশন করবে। জাতিসংঘের নানান পত্রিকা প্রকাশনা. বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলির তত্ত্বাবধানও দপ্তরের কর্তব্য।

জাতিসংঘের আয়-ব্যয়ের হিসাব মহাসচিব সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করেন। এছাড়া সাধারণ পরিষদের কার্যবিবরণী পেশ, কর্মসূচি প্রণয়ন প্রভৃতিও মহাসচিবের কর্তব্য। ব্যক্তি হিসেব তিনিই একমাত্র জাতিসংঘের সংস্থা ও সংগঠনগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। ট্রিগভে লীই (Trygve Lie) ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব। জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

জাতিসংঘ ও জাতিপুঞ্জের পার্থক্য

দীর্ঘদিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বের পরবর্তী প্রজন্মের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে মিত্রপক্ষ এক আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উভয় ক্ষেত্রেই একটি করে এই প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে–যথাক্রমে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) ও জাতিসংঘ (United Nations Organisation)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনেভায় যে জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি হয় বিশ্ব শান্তিরক্ষায় তা ব্যর্থ হয়। চৌদ্দ দফা দাবির অংশ হিসেবে জাতিপুঞ্জ ছিল যেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের মানস সন্তান। এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় নেতাগণ শিক্ষা নেন।

জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের অবসানে একটি আদর্শ হিসেবে। ইউরোপ তথা বিশ্ব এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্থলে মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দ পরাজিত দেশ জার্মানিকেই শাস্তি দেওয়ার ওপর জোর বেশি দেন। কিন্তু এবার যুদ্ধ অবসানের অনেক আগেই এই পরিকল্পনার শুরু হয়। বিশেষ কোনো আদর্শবোধ নয়, বাস্তব প্রয়োজনই ছিল জাতিসংঘের গঠনের মূল চালিকা শক্তি।

১৯৪১ সালের আটলান্টিক বৈঠক রুজভেল্ট-চার্চিল আলোচন থেকে শুরু করে ১৯৪৫-এর সানফ্রানসিস্কো সম্মেলন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিসংঘ গঠনের আলোচনা চলেছে। ফলে জাতিপুঞ্জের উৎপত্তির পর যে ধরনের সমস্যা বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে দেখা দেয় জাতিসংঘের ক্ষেত্রে সেগুলির অনেকটা সমাধান পূর্বেই হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে তিন রাষ্ট্র প্রধান, রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘের একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে দুটি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। যুদ্ধ রোধ করার প্রচেষ্টা হয়ত অনেক পুরনো কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা কার্যত জাতিপুঞ্জ দিয়েই শুরু হয়েছিল। সেই অর্থে জাতিসংঘ তারই উত্তরসূরী। প্রথমটি একটি

ধারণার সৃষ্টি করেছিল, দ্বিতীয়টি তার সার্থক পরিণতি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তুলনায় জাতিপুঞ্জের পরিষদ অনেক বেশি অসংহত বা ভঙ্গুর ছিল। প্রথমটিতে স্থায়ী সদস্যের ও তার সংখ্যার পরিবর্তন হয় বারবার। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা আজও অপরিবর্তিত আছে। শুধু রাজনৈতিক কারণে সর্বসম্মতভাবে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক চীন।

জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষ্ঠু বিভাজন ছিল না, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে তা আছে। সাধারণ পরিষদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদই সুস্পষ্টভাবে অধিক ক্ষমতার অধিকারী।

জাতিপুঞ্জের বিধি অনুযায়ী কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধই 'যুদ্ধ' হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে অনেক রাষ্ট্রই অঘোষিত যুদ্ধেরস্মারা তার স্বার্থসিদ্ধি করেছে। কিন্তু জাতিসংঘের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুদ্ধই নয়, যুদ্ধের সম্ভাবনা মাত্র দেখা দিলেই নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। তাছাড়া জাতিসংঘ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা করতে পারে জাতিপুঞ্জের সে শক্তি ছিল না।

বলা হয় যে 'ভেটো' ব্যবস্থা জাতিসংঘের কর্তব্য সম্পাদনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতিপুঞ্জের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিও একইরকম বাধার সৃষ্টি করতো। জাতিপুঞ্জ পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সদস্য পরিষদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য ছিল না, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সব সদস্য রাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য।

জাতিপুঞ্জের তুলনায় জাতিসংঘের কর্মসূচি অনেক ব্যাপক। রাজনৈতিক দিক বাদ দিলেও জাতিসংঘে ও তার অধীনস্থ বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির মাধ্যমে মানবাধিকার ও মানবকল্যাণসহ খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে। জাতিসংঘ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বৃহৎশক্তির স্বার্থে পরিচালিত হয় না।

জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘের তুলনামূলক আলোচনায় বোঝা যায় যে জাতিসংঘ যেন জাতিপুঞ্জের এক সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। জাতিসংঘ অনেক বেশি সংগঠিত, সুসংহত। যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধ অস্ত্রের বিনাশের মাধ্যমেই শুধু সম্ভব নয়। প্রয়োজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্যে দিয়েই তা সম্ভব। জাতিসংঘ সেই ধারণারই প্রসার ঘটিয়েছে।

সাফল্য ও ব্যর্থতা

অনেক রক্ত ও ধ্বংসের বিনিময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অশুভ শক্তির পরাভব সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বজনমত ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যায়। জাতিসংঘের জন্ম সেজন্য এক আশার আলোর সঞ্চার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সাম্রাজ্যের প্রায়শই অবসান ঘটায়। সদ্য স্বাধীন দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলি জাতিসংঘের মধ্যে তাদের রক্ষাকর্তাকে খুঁজে পায়। ১৯৪৬ সালে ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্য মোতায়েনের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন, মিশরের সুয়েজ সমস্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যদিকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, কৃষি ও খাদ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, শ্রমিক সংস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি সাহায্য করে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক, কারিগরি ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মানবাধিকার ও শিশু-কল্যাণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থাগুলি আজও প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে।

জাতিপুঞ্জের একটি সহজাত দুর্বলতা ছিল ভার্সাই সন্ধির সঙ্গে তার সংযোগ। জাতিসংঘ এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত আছে। কিন্তু তার উন্মোষপর্বে জাতিসংঘকেস্নায়ুযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে পড়তে হয়। পশ্চিমী জোট বনাম সোভিয়েত জোট এই দ্বন্দ্বে জাতিসংঘকে অনেক ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে হয়েছে। এখন অবশ্য সেই দ্বন্দ্ব আর নেই। তবে এ মুহূর্তে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে নতুনভাবে বাধাঁ সৃষ্টি করছে, আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। আফ্রো-এশিয় দেশগুলি জাতিসংঘে

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও চীন ছাড়া আর কেউই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের পদ পায়নি। সনাতনী সাম্রাজ্যবাদের অবসান হলেও নতুন মোড়কে তার উপস্থিতি আজও বিশ্ববাসীর শংকার কারণ। উচ্চমার্গের কূটনীতির দাবা খেলায় জাতিসংঘ এখনও অসহায় বোধ করে। জাতিসংঘের উপর একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরো গভীর হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও জাতিসংঘের উপযোগিতা মোটেই হ্রাস পায়নি। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্রও অনুন্নত দেশগুলি তাদের দুর্বল অস্তিত্বের আশংকায় জাতিসংঘকেই মনে করে শেষ বিচারের স্থল, স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর জাতিসংঘের ভূমিকা আরো ব্যাপক হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়-

(ক) ১৯৪২ সালে (খ) ১৯৪৩ সালে

(গ) ১৯৪৪ সালে (ঘ) ১৯৪৫ সালে

২। জাতিসংঘের সনদ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়-

(ক) ওয়াশিংটন সম্মেলনে (খ) মস্কো সম্মেলনে

(গ) সানফ্রান্সিকো সম্মেলনে (ঘ) তেহরুন সম্মেলনে।

৩। জাতিসংঘের প্রধান অঙ্গ সংখ্যা-

(ক) ৩ টি (খ) ৪ টি

(গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি

৪। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছে

(ক) একবার(খ) দুইবার

(গ) তিনবার(ঘ) চারবার

৫। জাতিসংঘের প্রথম সহাসচিবের নাম-

(ক) কফি আনান (খ) উথান্ট

(গ) টিগেভে লীই (ঘ) বুট্রোস ঘালিঃ

উত্তরঃ ১। (ক) ২। (গ) ৩। (ঘ) ৪। (খ) ৫। (গ)

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতিসংঘের উৎপত্তির পটভূমি আলোচনা করুন।

২. জাতিসংঘের প্রধান দুটি অঙ্গ সংস্থা সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩. জাতিসংঘ এবং জাতিপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষন করুন। জাতিসংঘ কতটুকু সফল হয়েছে ?

পাঠ - ৪

এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- অনুপনিবেশীকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতনের কারণসমূহ জানতে পারবেন;
- এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয় তখন পৃথিবীতে পরাধীন মানুষের সংখ্যা ছিল ৭৫ কোটি। অন্যদিকে ১৯৯১ সালে পরাধীন মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লক্ষ। পৃথিবীতে দ্রুতহারে পরাধীন দেশগুলো যে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল তার কারণ পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদের উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদান করে বা প্রদান করতে বাধ্য হয়। যে প্রক্রিয়ায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে তাকে অনুপনিবেশীকরণ বলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, আজও তা সম্পূর্ণ হয়নি। পৃথিবীর কিছু কিছু ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডে আজও ঔপনিবেশিক শাসন চালু আছে। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু ক্ষুদ্র দ্বীপ এখনও পরাধীন রয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতন হয়েছিল প্রধানত তিনটি কারণে।

(ক) জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশ;
(খ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতা;
(গ) জাতিসংঘের ভূমিকা।

(ক) জাতীয়তাবাদের উত্থান ও বিকাশ

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে উপনিবেশে জাগরণ সৃষ্টি হয়। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো শাসন ও শোষণের পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার কতগুলো মৌল উপাদান-যেমন ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসি বিপ্লব এই মহত্তম ঘটনাবলিতে মানুষের অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছিল। উপনিবেশগুলোতে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে তখন এই মহত্তম ঘটনাবলিও একটি ক্ষুদ্র অংশকে আলোড়িত করে। প্রতিটি উপনিবেশেই একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে। সংখ্যায় এরা ক্ষুদ্র হলেও অর্থবিত্তে এরা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী দেশের হাতে থাকায় এরা অসন্তুষ্ট ছিল। ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে করে। তাই প্রতিটি উপনিবেশে যখন আন্দোলন ও বিদ্রোহ দেখা দেয় তখন এরা নেতৃত্ব দেয়। এই শ্রেণীটির নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয় তা গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু তারা গণমানুষকে জড়িত করেছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শে। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দেখল যে, যদি এই শ্রেণীকে ক্ষমতা না দেয়া যায়, তাহলে শ্রমিক কৃষক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ছড়িয়ে পড়বে। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এই ক্ষুদ্র শ্রেণীর (উঠতি বুর্জোয়া) হাতে ক্ষমতা প্রদান নিরাপদ মনে করেছিল।

উপনিবেশে জাতীয়তাবাদ বিকাশে কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি প্রভাব ফেলে। কিছু বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৩টি রাজ্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছিল। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণায় মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছিল যা ব্যাপক মানুষকে অনুপ্রাণিত করে ছিল। অনেক ঐতিহাসিক আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক (Milstone of democratic revolution) বলে অভিহিত করেছেন। ফরাসি বিপ্লব

মানুষের স্বাধিকার,স্বাধীনতা অর্জনের পথে আরেক ধাপ এগয়ি বক্তব্য রেখেছিল। ১৯০৪ সালে জাপানের মত ক্ষুদ্র দেশের কাছে রাশিয়ার পরাজয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দু'টি কারণে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম জাপান একটি ক্ষুদ্র ও এশিয়ার দেশ, দ্বিতীয়ত এটি ইউরোপের একটি বড় শক্তিকে পরাজিত করেছিল। এরপর ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের কথা বলা যায় যা সর্বহারার বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। এই বিপ্লব উপনিবেশ বিরোধী বক্তব্যের জন্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগমান করেছিল। সর্বশেষ ঘটনাটি হচ্ছে, আটলান্টিক চার্টার। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েক ইউনিয়নের মত বৃহৎ শক্তি স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি হল আটলান্টিক চার্টার। এতে বলা হলো উপনিবেশের জনগণকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।

(খ) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতা

বৃহৎ দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হচ্ছে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এদের দুর্বলতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রকট হয়ে উঠে। এই দুর্বলতার কারণ কি? কিভাবে এই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল-এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করার পেছনে দুই মহাযুদ্ধ দায়ী ছিল। বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মূলত অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। প্রধানত, পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ব্রিটেনের তুলনায় ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় ছিল। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় আর্থার মাবউইক (Arthur Marwick) এর Explosion of British Society 1914-1918 গ্রন্থে। এখানে বৃটিশ সমাজে যুদ্ধের কিরূপ প্রভাব পড়েছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। আরো একজন লেখক হচ্ছেন ডি.এইচ. লরেন্স (D.H. Lawrence) যিনি জাতিতে ইংরেজ এবং উদারপন্থী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলো। তিনি ডেথ-অব ইংল্যান্ড (Death in England) শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। তিনি এতটাই বিষন্ন ছিলেন যে, ব্রিটেন ছেড়ে ইতালিতে চলে যান এবং এ কবিতা লেখেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৯-এর আগে ব্রিটেন ছিল সবদিক থেকে পৃথিবীর এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশটির অবক্ষয় শুরু হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার পতন ঘটে। ফ্রান্স ব্রিটেনের অনেক পরে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনের পর ফ্রান্সের অবস্থান ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে সরাসরিভাবে ফ্রান্স ব্রিটেনের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ প্রতিবেশী ফ্রান্সের উপরই জার্মানি সবচেয়ে বড় আগ্রাসন পরিচালিত করেছিল। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ছিলেন ‘বিজয়ের নামক' বা War Hero। অথচ তিনিই পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত হন। বিশ শতকের শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। তখন এ দু'টো রাষ্ট্রের ভিতর উপনিবেশ-বিরোধী জনমত গড়ে উঠে।

অতএব, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতাই ছিল অনুপনিবেশীকরণের বড় কারণ।

(গ) জাতিসংঘের ভূমিকা (Role of the United Nations)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সৃষ্টি হয়েছিল জাতিসংঘ। এই সংস্থাটি উপনিবেশীকরণ ত্বরান্বিত করেছিল। প্রথমত, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে স্বাধীনতা প্রদানের প্রশ্নে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। এটা হচ্ছে– "Declaration on the Granting Independence to the Colonial Countries and Peoples." ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এ সময় থেকেই জাতিসংঘ বিশষভাবে অনুপনিবেশীকরণের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। এই ঘোষণায় তিনটি মৌল বক্তব্য ছিল–

১. অনুপনিবেশীকরণ শর্তহীনভাবে ত্বরান্বিত ও দ্রুত করতে পারে।
২. উপনিবেশীবাদ মানবাধিকার পরিপন্থী এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে একটি বড় বাঁধা।
৩. জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি উপনিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

এই তিনটি বক্তব্যের মাধ্যমে জাতিসংঘ অনুপনিবেশীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা পালন করেছিল। এই ঘোষণার পর তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জাতিসংঘ বেশ কয়েকটি অঙ্গসংগঠন গড়ে তুলল। এরকম ৭টি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নিম্নরূপ–

১। অছি পরিষদ
২। অনুপনিবেশীকরণ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি
৩। নিরাপত্তা পরিষদ
৪। অবরোধ
৫। বিশেষ মিশন প্রেরণ
৬। উপনিবেশে নির্বাচন তত্ত্বাবধান
৭। কারিগরী সহায়তা।

এই ৭টি প্রতিষ্ঠান বা প্রক্রিয়াকে জাতিসংঘ তার ঘোষণা বাস্তবায়নে কাজে লাগিয়েছিল।

১. অছি পরিষদ ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ উপনিবেশগুলোকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয় অছি পরিষদের হাতে। পরিষদ উপনিবেশে যাতে কোনো মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হয় সেদিকে নজর দিবে।
দ্বিতীয়, উপনিবেশের জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করা, নিজেদের শাসন করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে অছি পরিষদ।

২. অনুপনিবেশীকরণ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি (Special Committee for De-colonization) ঃ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৬১ সালে এ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৯৬০ সালে ৪ ডিসেম্বরের ঘোষণা বাস্তবায়নের কাজ করে যাওয়া।

৩. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) ঃ মূল দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বশান্তিও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই দায়িত্বের পাশাপাশি অন্য আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে উপনিবেশে ঔপনিবেশিক শক্তি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে সংঘর্ষ যাতে যুদ্ধে রূপ নিলে তা মধ্যস্থতা ও মীমাংসা করা। জাতিসংঘ ঘোষণা করে যে, অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদ এজন্যে ব্যবস্থা নেবে।

৪. অবরোধ (Sanctions) ঃ এটা মূলত অর্থনৈতিক অবরোধ। অন্যান্য দেশসমূহের সাথে অবরোধভুক্ত দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হল মূল কাজ। যদি কোনো দেশ জোর করে উপনিবেশ দখল করে রাখে, তখন তার উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা যেতে পারে। যেমন, ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ নামিবিয়াকে জাতিসংঘ স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা জোর করে তা দখল করে রাখলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করে।

৫. বিশেষ মিশন প্রেরণ (Special Mission) ঃ এরকম বিশেষ মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য দু'রকম। প্রথমত, কোনো একটি উপনিবেশে কি রকম অবস্থা বিরাজ করছে তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোনো কোনো উপনিবেশে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মিলিয়ে বিশেষ মিশন প্রেরণ করা হয়। এরা জাতিসংঘে সরেজমিনে রিপোর্ট প্রেরণ করে।

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশের জনগণ স্বাধীন হতে চায় কিনা অথবা কখন হতে চায় তা বিচার করা। কারণ অনেক সময় উপনিবেশিক শক্তি জাতিসংঘে বলত, 'আমার উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনতা চায়না'। ফ্রান্স এ কাজটি করেছে সবচেয়ে বেশি।

৬. উপনিবেশে নির্বাচন তত্ত্বধান (Election Co-ordination in Colony) ঃ উপনিবেশে নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে জাতিসংঘ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল প্রেরণ করে।

৭. কারিগরী সহায়তা (Technical Assistance) ঃ উপনিবেশিক শাসনের দুটো প্রভাব রয়েছে (১) ইতিবাচক ও (২) নেতিবাচক। নেতিবাচক প্রভাবটি হচ্ছে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতা, উন্নয়নের জন্যে দক্ষ জনশক্তির অভাব। এছাড়া কারিগরী শিক্ষা,

গণমুখী শিক্ষা কখনই থাকে না। ফলে স্বাধীন হবার ঊষালগ্নে উপনিবেশগুলো যথার্থ অর্থে অসুবিধায় পড়ে।

এজন্যে জাতিসংঘ উপনিবেশগুলোতে কারিগরী সহায়তা দেয়। প্রশিক্ষণ দেয় উপনিবেশের জনগণকে। যেমন ১৯৯০ সালে নামিবিয়া স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই জাতিসংঘ পার্শ্ববর্তী জাম্বিয়াতে কারিগরী সহায়তা ও প্রশিক্ষণের জন্যে গড়ে তুলেছিল ইউনিন (United Nations Institute for Namibia UNIN) যা কয়েক হাজার নামিবিয়ানকে প্রশিক্ষণ দেয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশবাদের পতন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নানান শাসনতান্ত্রিক সুবিধা দানের বিনিময়ে অধীনস্থ দেশগুলোর জনসাধারণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সফল হয়নি। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর শোষণ ও অত্যাচারের সুযোগে অনেক সময় ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ তাদের মিত্রপক্ষ বিরোধী প্রচারক জোরদার করতে পেরেছে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' জাপানের এই শ্লোগান দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে তার প্রাথমিক সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উপনিবেশবাসীর ভুল ভাঙ্গতে অবশ্য বিলম্ব হয়নি। মিত্রপক্ষের প্রতি আক্রমণে তারা সহায়তা করেছে। উপনিবেশবাসীগণ মিত্রশক্তির জয়কে স্বাগত জানালেও তার অন্তর্ভুক্ত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনও তীব্র করে তোলে। ফলে অনেক উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অনেকে সেই লক্ষ্যে বহুদূর এগিয়ে যায়। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাম্রাজ্য একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়। নিম্নে বিষয়টি সংক্ষেপে দেশওয়ারী আলোচনা করা হল।

উত্তর আফ্রিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল সুদান। মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবেসখানেও আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৫৩ সালে ইঙ্গ-মিশরীয় সমঝোতা অনুসারে সুদানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে সুদান স্বাধীনতা লাভ করে ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রান্স ঃ ফরাসিগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে কোচিন চীনে। তারপর আন্নাম, টংকিং, ক্যাম্বোডিয়া ও লাওস অধিকার করে সম্মিলিতভাবে ফরাসি ইন্দোচীন গড়ে তোলে। এদের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্য থাকলেও সকলেই ফরাসি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। মেইজি পুনর ভ্যুদয়ের পর জাপানের দ্রুত উত্থান ও রুশ জাপান যুদ্ধে তার অবিস্মরণীয় বিজয় ইন্দোচীনের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটায়। ১৯১১ সালে চীনা বিপ্লবেও তারা অনুপ্রাণিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসংখ্য স্থানীয় লোক ফরাসিবাহিনীতে কাজ করলেও ফ্রান্স কোনো রকম রাজনৈতিক সুবিধা দান করেনি। ১৯২৫ সালের দিকে সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হো চি মিন জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের সুযোগে জাপান ইন্দোচীন অধিকার করে নেয়।

ইতিমধ্যে হো চি মিন তাঁর সংগঠন জোরদার করেন। তিনি জাপান এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হো চি মিন টংকিং-এর রাজধানী হ্যানয় অধিকার করেন, আন্নাম ও কোচিন চীনেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিতা করেন। এই তিনটি অঞ্চলকে যুক্ত করে তিনি ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্স এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়নি। ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া নিয়ে ইন্দোচীন ফেডারেশন তৈরির চেষ্টা হয়, যা হবে ফ্রান্সের একটি অংশ। হো চি মিন এই ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করেন। যুদ্ধ শুরু হয়। ফরাসিগণ পূর্বতন সম্রাট বাওদাইকে ভিয়েতনামের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সের সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন হো চি মিনের পক্ষ নেয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসিগণ পরাস্ত হয়। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম উত্তর ও দক্ষিণ দুভাগে বিভক্ত হয়। উত্তরে হো চি মিনের অধীনে কমিউনিস্ট সরকার, দক্ষিণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামের জন্ম হয় এবং দেশটি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে।

ব্রিটেন ঃ ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের স্বাধীনতা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের ভূমিকাকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়েই ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সুভাষ চন্দ্র বসু বিশ্বযুদ্ধের সুযোগেই জাপানি সহায়তায় আজাদ হিন্দু ফৌজ নিয়ে ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজও পরাস্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ডের পক্ষে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেওয়াই ছিল ব্রিটেনের পক্ষে থেকে সম্মানজনক পথ। এভাবে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে বার্মাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করে ভারত থেকে পৃথক করা হয়। কিন্তু বর্মার জনগণ সীমিত অধিকারে সন্তুষ্ট ছিল না। জাপান বার্মা অধিকার করে এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। জাপানীদের অশুভ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে অং সাং-এর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় ঘটলে ১৯৪৫ সালে বার্মায় পুনরায় ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। অং সাং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যান। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বার্মা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

শ্রীলংকাকেও ১৯৪৮ সালে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস প্রদান করা হয়। পঞ্চাশের দশকে পূর্ণ শ্রীলংকার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। একই সময়ে যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন ১৯৫৭ সালে মালয়কে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরে তুরস্কের শাসনের অবসান ঘটলেও ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব নিয়ে মিশরের সঙ্গে ইংল্যান্ডের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৫২-এ সামরিক অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। সেনাপতি নাগিব ও তার বিপ্লবী পরিষদের চাপে ইংরেজ সৈন্য সুয়েজ ছাড়া অন্য স্থান থেকে চলে যায়। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ হয়। এরপর ইংরেজ সৈন্য সুয়েজ ত্যাগ করলে মিশরের সার্বভৌমত্ব পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপান ইন্দোচীন ত্যাগ করার পূর্বে লাওসের স্বাধীনতা প্রদান করে যায়। স্বাধীন লাওস গড়ে ওঠে। ফ্রান্স ইন্দোচীন পুনরুদ্ধার করতে গেলে লাওসে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সের অধীনে লাওসের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। একটি নতুন সংবিধান ও জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৫৩ সালে লাওসের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ ছিল আলজিরিয়া। আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য করা হতো। বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় আলজিরিয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। যুদ্ধের পর ফ্রান্স আলজিরিয়ার জন্য এক নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে ও সেইমত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইন সভায় আরব ও ফরাসিদের সামনে আসন সংখ্যা স্বীকৃত হয়েছিল। নির্বাচনে ফরাসি বিরোধীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে ফ্রান্স নির্বাচন বাতিল করে দেয়। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়। ফরাসি সরকারও প্রচন্ড দমন নীতি অনুসরণ করে। জোট-নিরপেক্ষ দেশসমূহ আলজিরিয়ার সংগ্রামে সমর্থন জানায়। ১৯৫৮ সালে দ্যগল ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হলে আলজিরিয়া সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয়। ১৯৬২ সালে এক গণভোটের মাধ্যমে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

উত্তর আফ্রিকার মরক্কো ফরাসি ও স্পেনীয় অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ১৯৫০ সালে সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ ফ্রান্সের কাছে স্বাধীনতার দাবি জানান ও মরক্কোর রাজনৈতিক দলগুলোও একে সমর্থণ করে। ফরাসি সরকার দাবি প্রত্যাখ্যান করে ও দমননীতি শুরু করে। সুলতানকে নির্বাসিত করা হয়। মরক্কোয় উপজাতিগুলো বিদ্রোহ শুরু করে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকলে ফ্রান্স এর মীমাংসায় উপনীত হয়। সুলতানকে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৫৬ সালের ৫ এপ্রিল মরক্কোর স্বাধীনতা ফ্রান্স স্বীকার করে নেয়। ফরাসি ও স্পেনীয় অঞ্চল মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ মরক্কোর সৃষ্টি হয়।

মরক্কোর মতো তিউনিশিয়াও ছিল ফ্রান্সের একটি আশ্রিত রাজ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানেও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ফ্রান্স কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করে। হাবিব বরগুইবার নেতৃত্বে নিও দস্তুর দল অন্যান্য দলের সহযেগিতায় সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বিদ্রোহী গেরিলাগণ ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। তিউনিশিয়ার স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়। ১৯৫৬-এ স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয়।

লিবিয়া ইতালীয় উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ ও ফরাসি সেনা সেখানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাতে যোগ দেয়। লিবীয় জনসাধারণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করলে জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

হল্যান্ড ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ইংল্যান্ড ইংরেজ ও পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সেখানে ওলন্দাজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সুকর্নের অধীনে ইন্দোনেশিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছাড়াও সেখানে কমিউনিস্টগণ সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হল্যান্ড নাৎসিগণ বিধ্বস্ত করলে ইন্দোনেশিয়ার ওপর ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব কার্যত লোপ পায়। জাপান সহজেই ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে। তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়। জাপানিগণ বিতাড়িত হলে জাভা, মাদুরা ও সুমাত্রায় একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ওলন্দাজগণ ফিরে আসে ও এই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৪ সালে হল্যান্ডের সঙ্গে একযোগে একটি বৃহত্তর ইন্দোনেশিয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা নয়। কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস্যের ফলে তা ভেস্তে যায়। ফলে ওলন্দাজ নিপীড়ন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সুকর্ন হন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

পর্তুগাল ঃ পর্তুগালের অধীনস্থ এ্যাঙ্গালা ও মোজাম্বিকে অস্থিরতা দেখা দেয়, যদিও এ দুটি উপনিবেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিলম্ব হয়। ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন, দিউ অবশ্য কিছুকাল পর স্বাধীনতা লাভ করে ও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৬১ সালে ভারত সামরিক শক্তির মাধ্যমে গোয়ার স্বাধীনতা এবং ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি নীশ্চিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ১৯৪৫ সালে পৃথিবীতে পরাধীন মানুষ কত ছিল?
(ক) ৫০ কোটি (খ) ৭৫ কোটি
(গ) ১০০ কোটি (ঘ) ১২৫ কোটি।

২। জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে–
(১) ১৯০২ সালে (খ) ১৯০৩ সালে
(গ) ১৯০৪ সালে (ঘ) ১৯০৫ সালে।

৩। 'ডেথ অব ইংল্যান্ড' কবিতা কে লিখেছেন–
(ক) ডি,এইচ, লরেন্স (খ) শেলী
(গ) কীটস (ঘ) বায়রন।

৪। অনুপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘের কয়টি সংস্থা ভূমিকা রাখে–
(ক) ৪টি (খ) ৫টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি।

৫। শ্রীলংকা স্বাধীন হয় কত সালে?
(ক) ১৯৪৭ (খ) ১৯৪৮
(গ) ১৯৪৮ (ঘ) ১৯৪৯ সালে।

উত্তর ১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (ঘ)

রাচনামূলক প্রশ্ন

১। এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের পতনের প্রেক্ষাপট ও কারণ আলোচনা করুন।
২। অনুপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে জাতিসংঘের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩। এশিয়া ও আফ্রিকা উপনিবেশবাদ পতনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ - ৫

স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমন, সমাপ্তি ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ থেকে আপনি-

- স্নায়ু যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা কীভাবে ক্রমান্বয়ে কমে এসেছিল তা জানতে পারবেন;
- স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনের বিভিন্ন সূচক এবংস্নায়ু যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে যথাক্রমে ন্যাটো ও ওয়ারশো প্যাক্ট গঠিত হয়। উভয় শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শিক দ্বন্দ্ব বিশ্বব্যাপীস্নায়ু যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র এক অস্বাভাবিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে আরম্ভ করে যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাঁতাত (Detente) এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Co-existcnce) নামে অভিহিত করে ছিল। এর ফলেস্নায়ু যুদ্ধের গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় এবং আশির দশকের শেষ দিকেস্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়। যদিও কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর থেকে প্রকৃত অর্থে দাঁতাত-এর পর্যায় শুরু হয় তবে তার সূচনা হয়েছিল আরো আগে। ১৯৫৩ সালে শক্তিশালী একনায়ক স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার অবসান হয়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষণার পর আদর্শগত বাধা অপসারিত হয়। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল।
তবে কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর থেকেস্নায়ুযুদ্ধের মোড় পরিবর্তন হয়। কয়েকটি বিশেষ কারণ এই চরম উত্তেজনাময়স্নায়ুযুদ্ধের গতিকেহ্রাস করতে সাহায্য করে। যথা ঃ

১। কিউবা সংকট দুই পরাশক্তিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। আর উভয়ই মনে করে যে, যদি উত্তেজনা প্রশমন না করা যায় তবে আবার যুদ্ধের হুমকি সৃষ্টি করতে পার। সবাইকে নাড়া দেয় এ ঘটনা।
২। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে পারমাণবিক যুদ্ধ বাঁধলে কেউই বিজয়ী হতে পারতো না। উভয়ই জানতো পরস্পরকে ধ্বংস করার মতো যথেস্ট অস্ত্র মজুত আছে। কারণ ১৯৫০ এর দশকের পর থেকে উভয় পরাশক্তির পারমাণবিক অস্ত্রের পাল্লা সমান ছিল। এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না যে, আকস্মিক আক্রমণ করে তা দখল করা সম্ভভ হবে।
৩। পরবর্তীকালে যখন নিরস্ত্রীকরণ হয় তখন দেখা গেল উন্নত দেশগুলো অতি সতর্কীকরণ অবস্থায় রয়েছে। যা কখনই ধ্বংস করা সম্ভব ছিল না। তখন তাদের মধ্যে এমন একটি ধারণা জন্মে যে, গোটা পৃথিবী ধ্বংস হলেও বিজয়ী হওয়া কষ্টকর। তাই যে শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার ফলে ধীরে ধীরে উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হয়।
৪। ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এসব দেশস্নায়ু যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হয়নি। তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্যে উদগ্রীব ছিল এবং তারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নামে একটি তৃতীয় জোট গঠন করে। এ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলস্নায়ুযুদ্ধ অবসানে প্রচেষ্টা নেয়া এবং পরাশক্তি দ্বয়কে অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখা। এভাবে তৃতীয় বিশ্বের উত্থানের ফলে দ্বি-মেরুর বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রথম আঘাত আসে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অবস্থান নেয়। এরা জাতিসংঘের ভিতর ও বাইরে দুই পরাশক্তির উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখে।
৫। ১৯৪৯ সালের পর শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীনের আর্বিভাব ঘটে। ১৯৬০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার মতবিরোধস্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। কারণ প্রথম দিকে চীন-

সোভিয়েত মৈত্রী ছিল লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু ১৯৫০ এর দশকের শেষ দিকে এ দৃশ্যপটে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়া। চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক তিক্ততায় রূপ নেয়। সোভিয়েত নেতাদের তখন ধারণা জন্মে যে, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চীনকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। এমনি কৌশলগত কারণ তারা উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

৬। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা ও উত্তেজনা প্রশমনের আরো একটি কারণ। ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য খাতে অভূতপূর্ব উন্নতি করে। কিন্তু ১৯৫০ এর দশকের শেষদিকে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় উন্নয়ন অব্যাহত রাখা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে দরকার ছিল পাশ্চাত্য থেকে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য। কিন্তু পাশ্চাত্যের এ সাহায্য পেতে হলে দরকার ছিল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ করা। এ অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকটা বাধ্য হয়ে যুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতার পথ খোঁজে।

উত্তেজনা প্রশমনের সূচক

ষাটের দশকে উত্তেজনা হ্রাসের সুস্পষ্ট কতকগুলো লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উত্তেজনা প্রশমনের কতকগুলো সূচক বিশ্লেষণ করলে তা দেখা যাবে। যেমন-

১. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও সময়টাতে প্রাধান্য পেয়েছিল। দুই পরাশক্তি সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ না করে বরং সংযম দেখাতে শুরু করে। এতদিন তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু এ সময় থেকে তা নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনা (১) বা SALT-1 এর কথা উল্লেখ করা যায়।

এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার প্রথা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অলিম্পিক একটি বড় উদাহরণ।

২। প্রকাশ্য সামরিক হস্তক্ষেপের পরিবর্তে দুই পরাশক্তির পরোক্ষভাবে পরস্পরকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতো। যেমন USA পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিরোধীদের হাত করার চেষ্টা করতো। এবং একইভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্টদের সহায়তা করতো।

অর্থাৎ কম ঝুঁকিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পথে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এটাই ছিল দাঁতাদের বড় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য মাঝে মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল, যেমন ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে ক্ষমতার দখলে তারাবিকে সহযোগিতা করে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ কৌশল গ্রহণ করে। বিশেষকরে মুজাহিদদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য দিয়েছে, কিন্তু ভিয়েতনামের মতো সরাসরি সৈন্য পাঠায়নি। তাই এ সামরিক উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

আশির দশকে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত এর অবসানের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। অনেকে মনে করেন যে, ১৯৮৭ সালে দুই পরাশক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বা চুক্তির মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হ্রাসে এটি ছিল একটি অভূতপূর্ব ও যুগান্তকারী চুক্তি। এতে মাঝারি পাল্লার মজুত ক্ষেপণাস্ত্রের একটি বড় অংশ ধবংস করতে দুই পরাশক্তি ঐকমত্যে পৌছে। কাজেই এই প্রক্রিয়ায়স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়েস্নায়ু যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

স্নায়ু যুদ্ধের বিশ্ব পরিস্থিতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিশ্ব ব্যবস্থা ছিল বহুমেরুর। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দ্বিমেরু ব্যবস্থা লক্ষনীয় হয়ে উঠে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় (Unipolar system) রূপ নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি আর কারো নেই। সাম্প্রতিককালের আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ও ইরাক যুদ্ধ এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ।

অনেকে মনে করেন যে, এই একমেরুর ব্যবস্থায় আগামী কয়েক দশক কোনো পরিবর্তন আসবে না। আবার অনেকে মনে করেন এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য। যদিও যুক্তরাষ্ট্রকে কেউ চ্যালেঞ্জ করছেনা তবে এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক : এর পেছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। এখানে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

এক ঃ মৈত্রী আসঞ্জনশীলতায় ভাঙ্গন ঃ

সোভিয়েত ভীতি দূরীভূত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের এতদিনকার মিত্র দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক নতুন রূপ নিয়েছে। বলা যায় মৈত্রী আসঞ্জনশীলতা (Alliance Cohesion) দুর্বল হয়ে পড়েছে। একত্রীকরণের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমবায় বা European Union) বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ব্লক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। European Union এখন অনেক বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। যেমন যুক্তরাষ্টের বসনিয়া নীতি ইউনিয়ন অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থন করেনি। দ্বিতীয়ত, জাপানের নেতৃত্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় 'ইয়েন ব্লক' আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে জাপানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ বেড়েই চলেছে। যেমন, জাপানি গাড়ি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের বাজার দখল বিতর্ক। অনেক দিনের পুরোনো ইস্যু এই সমস্যাটি আজো মীমাংসিত হয় নি।

দুই ঃ আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব

স্নায়ুযুদ্ধের সময়েই বেশকিছু আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন এশিয়ায় ভারত ও চীন, আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল। এরা ছোট ছোট ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করছে। সম্প্রতি পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের হুশিয়ারি উপেক্ষা করেছে।

তিন ঃ মুসলিম মৌলবাদী শক্তির উত্থান

মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় বিকাশ লাভ করেছে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি। এক সময় যুক্তরাষ্ট্র এদেরকে অর্থ, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ইরান, আফগানিস্তানের তালেবান বিদ্রোহীরা এবং সৌদি চরমপন্থী ওসামা বিন লাদেন এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিপক্ষ। অথচ উভয় শক্তিই এক সময় যুক্তরস্ট্রের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের মৃত্যু হয় কবে-
(ক) ১৯৫১ (খ) ১৯৫২ (গ) ১৯৫৩ (ঘ) ১৯৫৪

২. কোন দেশের আবির্ভাবের পরস্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাস পেতে থাকে।
(ক) ভারত (খ) চীন (গ) মিশর (ঘ) চিলি

৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় কবে-
(ক) ১৯৮৭ (খ) ১৯৮৯ (গ) ১৯৯০ (ঘ) ১৯৯১

উত্তর ১। (গ), ২। (খ) ৩। (ঘ)

রচনামূলক প্রশ্ন

(ক) কোন কোন কারণে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা ক্রমশ হ্রাস পায় বর্ণনা করুন।
(খ) স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের বিভিন্ন সূচকগুলো আলোচনা করুন।
(গ) স্নায়ু যুদ্ধোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।